দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 29-OCT-2002
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

উপবৃত্তির নামে অনিয়ম

শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ এবং মানোন্নয়নের নিমিত্ত দেশে চালু রহিয়াছে প্রণোদনামূলক বিবিধ কর্মসূচী। নারী শিক্ষা বিস্তারের প্রশ্নে আরোপ করা হইয়াছে সবিশেষ গুরুত্ব। গ্রামাঞ্চলে হাইস্কুল পর্যায়ে মেয়েদের জন্য উপবৃত্তির ব্যবস্থা সাত আট বৎসর পূর্ব হইতেই ছিল। সাম্প্রতিককালে উহা উচ্চমাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বর্ধিত হইয়াছে। অন্যদিকে, প্রাথমিক স্কুল পর্যায়েও উপবৃত্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এইসব উদ্যোগ-আয়োজন নিঃসন্দেহে উৎসাহব্যঞ্জক। কিন্তু, সবকিছুর মধ্যে এমনকিছু ব্যাপার ঘটিয়া যাইতেছে, যাহা সাদা কাপড়ে কালির ছোপের মত কদর্য এবং বিসদৃশ। গত রবিবার এমনই একটি খবর ছাপা হইয়াছে পত্রিকান্তরে। কুড়িগ্রাম হইতে ওই পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা একটি স্কুলের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, ভুয়া তালিকা তৈয়ার করিয়া উপবৃত্তির টাকা আত্মসাৎ করা হইতেছে নির্বিবাদে। শিক্ষক-কর্মচারীরা বসিয়া থাকিয়াই মাসে মাসে বেতন পান। স্কুলটির নাম হাতিয়া উচ্চ বিদ্যালয়। সরেজমিন পরিদর্শনে গিয়া দেখা যায়, ওই স্কুলে ছাত্রী উপস্থিত ১৯ জন। খাতাপত্রে, শিক্ষক-কর্মচারী ২২ জন। কিন্তু এখানে উপবৃত্তির টাকা উঠান হয় ১১৮ জনের। আলোচ্য প্রতিবেদনে ভুয়া শিক্ষার্থীদের নামও উল্লেখ করা হইয়াছে। উপবৃত্তির গ্রহিতা কয়েকজন ভুয়া ছাত্রীর হিসাব নম্বর, পরিচয়পত্রের নম্বর ইত্যাদিও উল্লেখ করা হইয়াছে। মোটকথা, সংবাদদাতা একেবারে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, উপবৃত্তির নামে কেমন করিয়া একশ্রেণীর লোক লোপাটের উপায় বাহির করিয়া লইয়াছে। এইরকম পরিস্থিতিতে উপবৃত্তি প্রকল্পের মহৎ উদ্দেশ্য সফলতার মুখ দেখিবে কেমন করিয়া, সে এক চিন্তার বিষয়ই বটে। সূত্রমতে, কুড়িগ্রামের ওই হাতিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের মত দেশের নানাস্থানে আরও অনেক তথাকথিত স্কুল ও কলেজ আছে, যেখানে লেখাপড়ার পরিবর্তে ঘুষিয়া বসা হইয়াছে দুর্নীতির কারখানা। উপবৃত্তি চালু হইবার ফলে পল্লী এলাকায় মেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ প্রসারিত হইয়াছে, গ্রামের অনেক দরিদ্র ও মেধাবী মেয়ে এই সুযোগে শিক্ষিত হইয়া উঠিতেছে। চাকরি-বাকরি করিয়া অনেকে স্বাবলম্বি হইতেছে। এই সবই সত্য। পক্ষান্তরে অভিযোগ রহিয়াছে যে, একশ্রেণীর শিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীর যোগসাজশে এমনসব কাণ্ড ঘটিয়া চলিয়াছে, যাহা গুরুতর অন্যায় এবং অনভিপ্রেত।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান দুর্নীতির বিষয়টি অনাকাঙ্ক্ষিত হইলেও আমাদের দেশে ইহা ওপেনসিক্রেট ব্যাপার হইয়া দেখা দিয়াছে। শিক্ষার নামে অসাধুতার বিদ্যমান অস্ত্রধার ও মাত্রা সম্পর্কে বলিয়া শেষ করা যায় না। এক উপবৃত্তি নিয়া কিরূপ ফাঁকি-ফক্কিরি চলিতেছে সেই সম্পর্কে এইখানে অত্যেকটুখানি আলোকপাত করা বাঞ্ছনীয় মনে করি। মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তির জন্য একজন ছাত্রীকে বার্ষিক পরীক্ষায় ন্যূনতম ৪৫ শতাংশ নম্বর পাইবার শর্ত রহিয়াছে। কোনো মেয়ের বিবাহ হইয়া গেলে অর্থাৎ বিবাহিত কোনো ছাত্রী উপবৃত্তি পাইবে না। শর্ত আছে স্কুলে নিয়মিত উপস্থিতিরও। কোন শিক্ষার্থী এসএসসিতে একবার ফেল করিলে পরে আর এই বৃত্তি পাইবে না। এই সমস্ত শর্ত জুড়িয়া দিবার উদ্দেশ্য যাহাতে মেয়ে শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ায় মনোযোগী হয় এবং প্রকৃত মেধাবী ও পড়ুয়া মেয়েরাই যাহাতে সরকারী সহযোগিতা পাইতে পারে। কিন্তু অভিযোগ আছে যে, অনেক স্কুলে উপরোক্ত শর্তাবলী মানিয়া চলিবার পরিবর্তে নানা ফাঁক ও ফাঁকি বন্ধ করিয়া নেওয়া হইয়াছে। বিবাহিতা, কাজের মেয়ে এবং কোনো দিনই স্কুলে আসে নাই এমন অনেক মেয়ের নামে বৃত্তির টাকা উত্তোলন করা হয়। নিয়মিত ছাত্রীদেরও ন্যূনতম নম্বর পাওয়ার কোন দরকার পড়ে না অনেক ক্ষেত্রে। ভুয়া নম্বর সিট বানাইয়া ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অফিসে দাখিল করা হয়। উল্লেখ্য, উপবৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রীদের স্কুলের বেতনও ফ্রি। তাহাদের বেতনের নির্ধারিত টাকা হিসাব করিয়া সরকারী কোষাগার হইতে পরিশোধ করা হয়। স্কুলের আশপাশের শিক্ষিত লোকেরা জানিয়া শুনিয়াও নাকি উপবৃত্তির অনিয়মের প্রতিবাদ করেন না। কারণ, অন্যায়ভাবে যেসব মেয়ের নামে উপবৃত্তির টাকা উত্তোলন করা হয়, তাহারা নাকি গ্রামের লোকেদের কাহারও না কাহারও বউ ঝি। হয়ত তিন-চার মাস পরে পরে (যখন বৃত্তির টাকার বরাদ্দ আসে)। একবার সই নিয়া পাঁচশ'র মধ্যে দুইশ টাকা ধরাইয়া দেওয়া হয়। আর তিনশতই মারিয়া দেওয়া হয়। এটাই মাউ লাভ। আর্দালের বেশী টাকা যে আত্মসাৎ করা হইল, তাহাতে যেন কাহারও কিছু আসে যায় না। এইসব ভুয়া মেয়েদের নামে টিউশন ফি-টাও কিন্তু আসে যথারীতি। যাহা স্কুলের ওই শ্রেণীর শিক্ষকগণ 'একমত ভাগ হলাম' বিবেচনা করিয়া ভক্ষণ করেন বলিয়া জানা যায়। এইরূপে উপবৃত্তিকে যাহারা লুটের বৃত্তির উপায় হিসাবে গ্রহণ করিয়া চলিয়াছে, তাহারা যে শিক্ষা ও সামাজিক জীবনাচারের মধ্যে কতখানি বিষক্রিয়া সৃষ্টি করিতেছে, তাহা ভাবিতে গেলে বিচলিত বোধ না করিয়া উপায় নাই। সমাজের বদ্ধ বদ্ধ গ্রামাঞ্চলের সহজ সরল মানুষের গৃহাভ্যন্তরে ইহারা দুর্নীতির জহর ছড়াইয়া দিতেছে। ভবিষ্যৎ মায়েদের অনেককে দুর্নীতি শেখান হইতেছে। দেশ জুড়ি চায় শিক্ষিত মা। আর দুর্নীতিবাজ এক শ্রেণীর শিক্ষক শিক্ষার নামে পল্লীর অনেক বালিকা ও তরুণীকে সামান্য টাকা দিয়া দুর্নীতির সবক দিতেছে। এ তো ভয়ানক বিপদের কথা। এ অবস্থাটি মানিয়া নেওয়া যায় না।

শিক্ষকদের জীবনমানের উন্নয়ন এবং তাহাদের সংবৈধানিক নিরাপত্তার প্রশ্নে সরকারের প্রয়াসশীলতা দৃষ্টিগ্রাহ্য। বেসরকারী শিক্ষকরা এখন মূল বেতনের ৯০ শতাংশ সরকারী কোষাগার হইতে পাইয়া থাকেন। গঠিত হইয়াছে বেসরকারী শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্ট। অবসর গ্রহণের পর শিক্ষকরা সরকারী কর্মচারীদের মতই বেনিফিট পাইবেন। এইগুলি ভাল উদ্যোগ। আমরা সমর্থন করি। কিন্তু এতসব সুযোগ সুবিধা দেওয়ার পরেও শিক্ষকদের কেহ কেহ দুর্নীতির পক্ষে হাবুডুবু খাইবে, কর্তব্যকর্মে অবহেলার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিবে—এ কেমন কথা। উপবৃত্তি সংক্রান্ত দুষ্কর্মে শিক্ষাবিভাগ এবং উপবৃত্তিপ্রকল্পের একশ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর যোগসাজশ যে আছে, তাহা বলিবার দরকার পড়ে না। সুষ্ঠু তদারকি এবং যথার্থ জবাবদিহিতা থাকিলে শিক্ষা নিয়া এইরূপ দুর্নীতি চলিতে পারিত না। উপবৃত্তি নিয়া দুর্নীতি অবশ্যই বন্ধ করিতে হইবে। যেসব শিক্ষক এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী এই ধরনের অনৈতিক কার্যকলাপ তথা উপবৃত্তির সহিত জড়িত, তাহাদের সনাক্ত করিয়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া অত্যাবশ্যক।